সাধনার ইতিবৃত্তে এক সন্ন্যাসী

তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্য

রম্যাঁ রলাঁ কালিদাস নাগকে ১৯২৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর সোমবার একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন যে, 'মানুষ যা দেখে থাকে ও অনুভব করে থাকে তার এক দশমাংশও লেখে না।' কথাটি বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য এই কারণে যে মাত্র কয়েকজন বাদ দিলে ঐসব বিপ্লবীরা তাঁদের বিপ্লবী জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে যেতে পারেননি বেশ কিছুটা পরিস্থিতি অত্যন্ত প্রতিকূল ছিল বলে এবং অন্যদিকে বিপ্লবী জীবনে পদার্পণের শুরুতেই তাঁদের প্রতিজ্ঞা নিতে হতো এই মর্মে যে, তাঁদের বিপ্লবী জীবনের কথা বা কাজ সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে। এ সত্ত্বেও আমরা কিছু কিছু বিপ্লবীদের স্মৃতিচারণা বা আত্মজীবনী বা ডায়েরি অথবা চিঠিপত্র সৌভাগ্যক্রমে পেয়েছি। বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে একজন চিরপ্রণম্য বিপ্লবী।

আকারে খুব বড়ো না হলেও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নির্বাসিতের আত্মকথা* বাংলার বিপ্লবের ইতিহাসগুলির মধ্যে একটি অন্যতম আকরগ্রন্থ, যা কিনা এক অসামান্য এবং অমূল্য-স্মৃতিসম্ভার। জেনে নেওয়া যাক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি পড়ে কি বলেছিলেন। সৈয়দ মুজতবা আলী উল্লেখ করেছেন :

> একদিন শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে দেখি এক গাদা বই গুরুদেবের কাছ থেকে লাইব্রেরীতে ভর্তি হতে এসেছে। গুরুদেব প্রতি মেলে বহু ভাষার পুস্তক পেতেন। তাঁর পড়া হয়ে গেলে তার অধিকাংশ বিশ্বভারতী পুস্তকাগারে স্থান পেত। সেই গাদার ভিতর দেখি 'নির্বাসিতের আত্মকথা'।...বইখানা ঘরে নিয়ে এসে এক নিঃশ্বাসে শেষ করলুম। কিছু মাত্র বাড়িয়ে বলছিনে, এ বই সত্য সত্যই আহার-নিদ্রা ভোলাতে পারে।
>
> পরদিন সকালবেলা গুরুদেবের ক্লাসে গিয়েছি। বই খোলার পূর্বে তিনি শুধালেন "উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' কেউ পড়েছ? বইখানা প্রকাশিত হওয়া মাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছে;...
>
> বললুম—'পড়েছি।'
>
> শুধালেন—'কি রকম লাগলো?'
>
> আমি বললুম—'খুব ভাল বই।'
>
> রবীন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আশ্চর্য বই হয়েছে। এ রকম বই বাঙলাতে কম পড়েছি।'

অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ এই গ্রন্থ, সঙ্গে রয়েছে কৌতুকের অসামান্য সমাবেশ। পাশাপাশি রয়েছে লেখকের নিজের অভিমত এবং মহামূল্যবান আত্মোপলব্ধি। শুরুতেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এদেশের বিপ্লবপন্থীরা 'অ্যানারকিস্ট নহেন'। বিপ্লববাদের উৎপত্তির ব্যাখ্যাও সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করি রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর স্নেহের ভাইঝি ইন্দিরা দেবীচৌধুরির এই গ্রন্থ সম্পর্কে অভিমত : "এ বই একবার ধরলে শেষ করবার ইচ্ছা নভেলের তুলনায় কিছু কম হয় না। অনেকদিন কোনো বাঙ্গলা বই পড়ে এত তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইনি, এমন মন খুলে অন্যের

কাছে প্রশংসা করিনি।...এর মধ্যে এত রকমের এত ছবি, এত গল্প, এত তথ্য, এত বর্ণনা নদীর মতো বহমান যে তার স্রোতে দুঃখের জঞ্জাল কোথায় ভেসে যায়।...যাঁর হাত থেকে এই রকম বই বেরোয়, তার হাতের পিছনে যে মন আছে সে মন আমাদের নমস্য;...এ বইয়ের একটি মহৎ গুণ এই যে তা নিঃসঙ্কোচে আবালবৃদ্ধবণিতার হাতে দেওয়া যায় ও নির্ভয়ে পারিবারিক মজলিসে টেচিয়ে পড়া যায়।"

আর এ গ্রন্থ সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলীর বক্তব্য হলো, "ছেলেবেলায় বইখানা পড়েছিলুম এক নিঃশ্বাসে, কিন্তু আবার যখন সেদিন বইখানা কিনে এনে পড়তে গেলুম তখন বহুবার বইখানা বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকতে হলো।...ভাষার দখল অনেক লোকেরই আছে, কিন্তু একই ভাষার ভিতর এত রকমের ভাষা লিখতে পারে ক'জন?"

১৯০৬ থেকে এ গ্রন্থের শুরু। প্রথমে মাস্টারিতে মন বসানোর চেষ্টা করেও উপেন্দ্রনাথ মন বসাতে পারেননি। এই সময়ই হঠাৎ তাঁর হাতে এসে পড়ে 'বন্দে মাতরম' কাগজ। তারপরে গেলেন 'যুগান্তর'-এর আড্ডাতে, যাকে নিয়ে 'লোকে কানাকানি করে যে যুগান্তরের আড্ডাটা নাকি একটা বিপ্লবের কেন্দ্র।' তারপর পাচ্ছি 'যুগান্তর'-এর আড্ডার এক সরস বর্ণনা। সেখানেই অন্যান্যদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ হয় দেবব্রত বসু, (যিনি পরবর্তীকালে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নামে পরিচিতি লাভ করেন) স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য (যিনি উপেন্দ্রনাথের ভাষায়, 'পাগলদের সংসারে গৃহিণী বিশেষ') এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, যিনি '৫০ টাকা পুঁজি লইয়া যুগান্তর চালাইতে বসিয়াছে।' আর 'যুগান্তর' অফিসে গিয়ে উপেন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, "৩/৪টি যুবক মিলিয়া একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া ভারত উদ্ধার করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধের আসবাবের অভাব দেখিয়া মনটা একটু দমিয়া গেল বটে, কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য। গুলি গোলার অভাব তাঁহারা বাক্যের দ্বারাই পূরণ করিয়া দিলেন। দেখিলাম, লড়াই করিয়া ইংরেজকে দেশ হইতে হঠাইয়া দেওয়া যে একটা বেশি কিছু বড় কথা নয়, এ বিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত।" এই বিবরণের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে খুব মিল রয়েছে 'জীবনস্মৃতি'-তে রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত 'সঞ্জীবনী সভা'-র বিবরণ। এই যুগান্তর অফিসেই উপেন্দ্রনাথের

ইংরেজদের 'টিকটিকি' অর্থাৎ পুলিশের গোয়েন্দা বা ইনফর্মার দর্শন লাভ হয়েছিল। উপেন্দ্রনাথ তা জানিয়েছেন তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় : "বাড়ীর সম্মুখে দুই-একটি লোককে প্রায়ই দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতাম, আমাদের দেখিলে তাহারা কেহ আকাশ পানে চাহিত, কেহ সম্মুখের চায়ের দোকানে ঢুকিয়া পড়িত, কেহ বা শিস দিতে দিতে চলিয়া যাইত। শুনিতাম—সেগুলি নাকি সি-আই-ডি'র অনুগৃহীত জীব।" তারপরেই লেখকের উক্তি, 'সি-আই-ডি। ফুঃ! কে কার কড়ি ধারে?' মুরারীপুকুর বাগানে থাকার সময়ও টিকটিকি দর্শন হয়েছিল, "দেখিলাম বাগানের আশেপাশে রকম বেরকমের অজানা লোক ঘুরিতেছে। রাস্তা চলিবার সময়ও দুই-একজন পিছে পিছে চলিয়াছে। একদিন চলিতে চলিতে হঠাৎ পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, একজোড়া প্রকান্ড গোঁফের উপর হইতে দুইটা গোল গোল চোখ আমার দিকে প্যাঁট প্যাঁট করিয়া চাহিয়া আছে। যেদিকে যাই, চোখ দুইটা আমার পিছে পিছে ছুটিতে লাগিল। শেষে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গিয়া সেদিন কোনরূপে সে শনির দৃষ্টি হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম।"

এরপর আমরা পাচ্ছি 'যুগান্তর' অফিসে খানাতল্লাসীর কাহিনী, যার ফলস্বরূপ 'যুগান্তর'-এর প্রিন্টার বসন্তকুমারকে জেলে যেতে হয়।

স্থির হলো 'যুগান্তর'-এর জনকতক যুবককে নিয়ে মানিকতলার বাগানে নতুন আড্ডা বসাতে হবে। সেখানে আহারের মধ্যে ছিল ভাতের সঙ্গে ডাল আর তরকারি। বেশিরভাগ দিনই ডালের মধ্যে দু-একটা আলু ফেলে দিয়ে তরকারির অভাব মেটানো হতো। উপার্জনের পথ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল সব্জি চাষ এবং হাঁস মুর্গী পালন। আর 'বাজে খরচের মধ্যে ছিল চা' আর উপেন্দ্রনাথকেও 'মাঝে মাঝে রন্ধন-বিদ্যার নিগূঢ় রহস্য লইয়া নাড়াচাড়া' করতে হতো। বিপ্লবীদের সংসারটা কিরকম ছিল তার কথাও উপেন্দ্রনাথ জানাতে ভোলেননি:

> থালা-ঘটি-বাটির নামগন্ধ বাগানে বড় বেশী ছিল না। প্রত্যেকের এক একটা নারিকেল মালা আর একখানা করিয়া মাটির সানকি ছিল; তাহাই আহারাদির পর ধুইয়া মুছিয়া রাখিয়া দিতে হইত। কাপড় সকলেই নিজের হাতে সাবান দিয়া কাচিয়া লইত; যাহারা একটু বেশী বুদ্ধিমান, তাহারা পরের কাচা কাপড় পরিয়াই কাজ চালাইয়া দিত।

আর পড়াশুনোর মধ্যে ছিল ধর্মশাস্ত্র, রাজনীতি ও ইতিহাসচর্চা। কিছুদিন যেতে না যেতেই বাগানে পুলিশের ঘোরাঘুরি বেড়ে যায়।

এর পরেই উপেন্দ্রনাথ সাধুসঙ্গ করতে বেরিয়ে পড়েন এলাহাবাদে, বিন্ধ্যাচলে, চিত্রকূটে, অমরকন্টকে, নেপালে এবং বাঁকিপুরে। শেষে আবার মানিকতলার বাগানে ফিরে আসেন। সেখানে একদিন এক সাধুর আগমন হয়। তার পরের ঘটনা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান। উপেন্দ্রনাথ বর্ণনা দিয়েছেন :

> সাধু বলল—সকলের জন্য এ সাধনা নয়, শুধু নেতাদের জন্য। যাহারা দেশের লোককে পথ দেখাইবে, তাহাদের নিজেদের পথটা জানা চাই। দেশ স্বাধীন করিতে হইলেই যে খুব খানিকটা রক্তারক্তি দরকার,—এ কথাটা সত্য নাও হইতে পারে।...
>
> দেখ বাবা, যে কথাটা আমি বলিতেছি, তাহা জানি বলিয়াই বলিতেছি। তোমরা যে উদ্দেশ্যে কাজ করিতেছ, তাহা সিদ্ধ হইবে, কিন্তু যে উপায়ে হইবে ভাবিয়াছ, সে উপায়ে নয়। আমার বিশ বৎসরের সাধনার ফলে আমি ইহাই জানিয়াছি। চারিদিকে অবস্থা এক সময় এমনি হইয়া দাঁড়াইবে—যে সমস্ত রাজ্যভার তোমাদের হাতে আপনা হইতেই

আসিয়া পড়িবে। তোমাদের শুধু শাসন ব্যবস্থা পণালী গড়িয়া লইতে হইবে মাত্র। আমার সঙ্গে তোমরা জন কতক এস; সাধনার প্রত্যক্ষ ফল যদি কিছু নাও পাও, ফিরিয়া আসিও।

মনে রাখতে হবে ঘটনাটি সেই ১৯০৮ সালের।

এদিকে মানিকতলার বাগানের চার পাশে দিনে দিনে পুলিশের গোয়েন্দাদের, ইনফর্মারদের আনাগোনা বেড়েই চলেছে। অবশেষে সেই অভিশপ্ত দিনটি এসে উপস্থিত হলো। সে দিনটির কথা উপেন্দ্রনাথের লেখনীতে নিখুঁতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। উদ্ধৃতিটি একটু দীর্ঘ হলেও লোভ সামলাতে পারলাম না।

রাত্রি যখন প্রায় চারটা, তখনও গ্রীষ্মের জ্বালায় কতকটা মশার কামড়ে শুইয়া শুইয়া ছটফট করিতেছি। এমন সময় শুনিলাম যে কতকগুলো লোক মস্‌মস্‌ করিয়া সিঁড়িতে উঠিতেছে; আর তাহার একটু পরেই দরজায় ঘা পড়িল—গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌। বারীন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই একটা অপরিচিত ইয়োরোপীয় কণ্ঠে প্রশ্ন হইল :—

'Your name?'

'Barindra Kumar Ghosh.'

হুকুম হইল—'বাঁধো ইস্‌কো।'

বুঝিলাম ভারত উদ্ধারের প্রথম পর্ব এহখানেই সমাপ্ত। তবুও মানুষের যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। পুলিশ প্রহরীরা ঘরে ঢুকিয়া যাহাকে পাইতেছে তাহাকে ধরিতেছে, কিন্তু ঘর তখনও অন্ধকার। ভাবিলাম—Now or never. আর একটা দরজা দিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া দেখিলাম, চারিদিকে আলো জ্বালিয়া পুলিশ প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। রান্নাঘরের একটা ভাঙ্গা জানলা দিয়া বাহিরে লাফাইয়া পড়া যায়; সেখানে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম নীচে দুইজন পুলিশ প্রহরী। হায় রে! অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়! অগত্যা বারান্দার পাশে একটা ছোট ঘর ছিল, তারই মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। ঘরটি ভাঙাচুরা কাঠ-কাঠরায় পরিপূর্ণ; আরসোলা ও ইঁদুর ভিন্ন অপর কেহ সেখানে বাস করিত না। চাহিয়া দেখিলাম, একটা জানলার সম্মুখে একখানা জরাজীর্ণ চটের পর্দা ঝুলিতেছে। তাহারই আড়ালে দাঁড়াইয়া জানলার ফাঁক দিয়া পুলিশ প্রহরীদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। সে রাতটুকু যেন আর কাটে না।

ক্রমে কাক ডাকিল; কোকিলও এক-আধটা বোধহয় ডাকিয়াছিল। পূর্বদিক একটু পরিষ্কার হইলে দেখিলাম বাগান লাল পাগড়িতে ভরিয়া গিয়াছে। কতকগুলি গোরা সার্জেন্ট হাতে প্রকান্ড প্রকান্ড চাবুক লইয়া ঘুরিতেছে। পাড়ার যে কজন কোচম্যান-জাতীয় জীবকে খানাতল্লাসের সাক্ষী হইবার জন্য পুলিশের কর্তারা সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিলেন তাহারা এক বিপুলাকার ইন্সপেক্টর সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 'হুজুর হুজুর' করিতে করিতে ছুটিতেছে। পুকুরঘাটের একটা প্রকান্ড আমগাছের তলায় আমাদের হাতবাঁধা ছেলেগুলো জোড়া জোড়া বসিয়া আছে; আর উল্লাসকর তাহাদের মধ্যে বসিয়া ইন্সপেক্টর সাহেবের ওজন তিন মণ কি সাড়ে তিন মণ এই সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ বিচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

ক্রমে ছয়টা বাজিল, সাতটা বাজিল; আমি তখনও পর্দানশিন বিবিটির মত পর্দার আড়ালে। ভাবিলাম, এ যাত্রায় বুঝি কর্তারা আমাকে ভুলিয়া যায়! কিন্তু সে বৃথা আশা বড় অধিকক্ষণ পোষণ করিতে হইল না। আমাদের অতিকায় ইন্সপেক্টর সাহেব জুতার শব্দে পাশের ঘর কাঁপাইতে কাঁপাইতে আসিয়া আমার ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিলেন।

পাছে নিঃশ্বাসের শব্দ হয় সেই ভয়ে আমি নাক টিপিয়া ধরিলাম, কিন্তু বলিহারী পুলিশের ঘ্রাণশক্তি। সাহেব সোজা আসিয়া আমার লজ্জা-নিবারণী পর্দাখানি একটানে সরাইয়া দিলেন। তারপরই চারিচক্ষের মিলন—কি স্নিগ্ধ! কি মধুর! কি প্রেমময়! সাহেব তো দিগ্‌বিজয়ী বীরের মতো উল্লাসে এক বিরাট 'Hurrah'ধ্বনি করিয়া ফেলিলেন। সেই ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চারপাঁচজন পার্ষদ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহ ধরিল আমার পা, কেহ ধরিল হাত, কেহ ধরিল মাথা। তাহার পর কাঁধে তুলিয়া হুলুধ্বনি করিতে করিতে আমাকে একেবারে হাতবাঁধা ছেলের দলের মাঝখানে বসাইয়া দিল। আমার হাত বাঁধিবার হুকুম হইল। যে পুলিশ প্রহরী আমার হাত বাঁধিতে আসিল—হরি! হরি! সে যে আমাদের 'বন্দেমাতরম' অফিসের ভূতপূর্ব বেহারা! কতকাল সে আমাকে বাবু বলিয়া সেলাম করিয়া চা খাওয়াইয়াছে। আজ আমার হাত বাঁধিতে আসিয়া সে বেচারীও লজ্জায় মুখ ফিরাইল।

কি অসাধারণ বর্ণনা। আর তার মধ্যেও রয়েছে কৌতুকের ছোঁয়া।

তবে আলিপুর জেলে গিয়ে উপেন্দ্রনাথের আত্মোপলব্ধি হয়েছিল যে, 'চুপচাপ একেবারে ভেড়ার দলের মতো ধরা পড়িলাম। এ দুঃখ যে মরিলেও ঘুচিবে না।' জেলে প্রায় সাত হাত লম্বা পাঁচ হাত চওড়া কুঠরির মধ্যে শুরু হয়েছিল আর-এক জীবন। ঐটুকু জায়গার মধ্যে উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র নলিনীকান্ত গুপ্ত আর ন্যাশনাল কলেজের পলাতক ছাত্র শচীন্দ্রনাথ সেন। আর সেই কুঠরির ভেতরের চিত্রটির কথা না জানলেও তো বর্তমান স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা আমাদের বিবেকের কাছে অপরাধী হয়ে থাকবো। সেই চিত্রের কিছুটা অংশ উপেন্দ্রনাথের লেখা থেকে উল্লেখ করি: "সেই কুঠরির এক কোণে শৌচ ও প্রস্রাবের জন্য দুইটি গামলা! তিন জনকেই সেখানে কাজ সারিতে হয়; সুতরাং একজন ঐ অবশ্যকর্তব্য অশ্লীল কর্মটুকু করিতে গেলে আর দুইজনের চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কুঠরির সামনে একটি ছোট বারান্দা। সেইখানে হাত মুখ ধুইবার ও স্নানাহার করিবার ব্যবস্থা।"

'নির্বাসিতের আত্মকথা'-র লেখক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবার আসি আলিপুর জেলে বন্দীদের জন্য বরাদ্দ খাবারদাবারের কথায়। উপেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, "সকালবেলা উঠিতে না উঠিতেই একটা প্রকাণ্ড কালো জোয়ান বালতি হইতে সাদা

সাদা কি খানিকটা আমাদের লোহার থালার উপর ঢালিয়া দিয়া গেল। শুনিলাম, উহাই আমাদের বাল্যভোগ এবং আলিপুরী ভাষায় উহার নাম 'লপ্‌সি'। লপ্‌সি কিরে বাবা! শচীন দূর হইতে খানিকটা পরীক্ষা করিয়া বলিল,—'ওহো! এ যে ফেন মেশানো ভাত!' পরদিন দেখিলাম ডালের সহিত মিশিয়া লপ্‌সি পীতবর্ণ ধরিয়াছে; তৃতীয় দিন দেখিলাম উহা রক্তবর্ণ। শুনিলাম উহাতে গুড় দেওয়া হইয়াছে এবং উহাই আমাদের প্রাতরাশের রাজ সংস্করণ। সাড়ে দশটার সময় একটা টিনের বাটির একবাটি রেঙ্গুন চালে ভাত, খানিকটা অড়হড় ডাল, খানিকটা পাতা ও ডাঁটাসিদ্ধ এবং একটু তেঁতুল-গোলা। সন্ধ্যার সময়ও তদ্বৎ, কেবল তেঁতুল গোলাটুকু নাই।"

এরপর উপেন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন যে, পয়সা দিলেই জেলখানার ভেতর সব কিছুই পাওয়া যায় : "জেলের প্রহরী ও পাচকের হাতে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিতে পারিলেই ভাতের ভিতর হইতে কৈমাছ ভাজা ও রুটির গাদার ভিতর হইতে আলু পেঁয়াজের তরকারি বাহির হইয়া আসে; এমনকি পাহারাওয়ালার পাগড়ির ভিতর হইতে পান ও চুরুট বাহির হইতেও দেখা গিয়াছে।" প্রসঙ্গত, এই ধরনের আর-একটি ঘটনার কথাও উপেন্দ্রনাথের গ্রন্থ থেকে পাচ্ছি : "কর্তৃপক্ষের চক্ষুর অগোচরে জেলের মধ্যে গাঁজা, গুলি, আফিম, সিগারেট, সবই যে রাস্তা দিয়া যাইতে পারে, সে রাস্তা দিয়া পিস্তল যাওয়া তো বিচিত্র নয়।" অন্যদিকে, আলিপুর জেলে এ ঘটনাও ঘটেছে যে, জেলার বা জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট আসবার আগেই দু-একজন পাহারাদার বন্দীদের সতর্ক করে দিয়েছেন, যাতে বন্দীরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ করে দেন।

আলিপুর জেলে গানের আড্ডার কথাও উপেন্দ্রনাথের গ্রন্থে রয়েছে। দু-একজন বন্দী বিপ্লবী স্বদেশী গান গেয়ে আসর মাতিয়ে রাখতেন। এবং এত প্রতিকূলতা এবং অত্যাচারের মধ্যে বন্দী বিপ্লবীদের মধ্যে হাসিঠাট্টার ঘাট্‌তি ছিল না। দু-একটি নমুনা দিই। অবশ্যই উপেন্দ্রনাথের জবানীতে। প্রথমটি হলো : "কানাইলাল প্রমুখ চার পাঁচজন নিদ্রার কাজটা সন্ধ্যার পরেই সারিয়া লইতো। রাত ১০টা-১১টার সময় সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িত তখন তাহারা বিছানা ছাড়িয়া কাহার কোথায় সন্দেশ, আম বা বিস্কুট-লুকানো আছে তাহার সন্ধান করিয়া ফিরিত। যেদিন সে সব কিছু মিলিত না, সেদিন একগাছা দড়ি দিয়া কাহারও হাতের সহিত অপরের কাছা বা কাহারও কানের সহিত অপরের পা

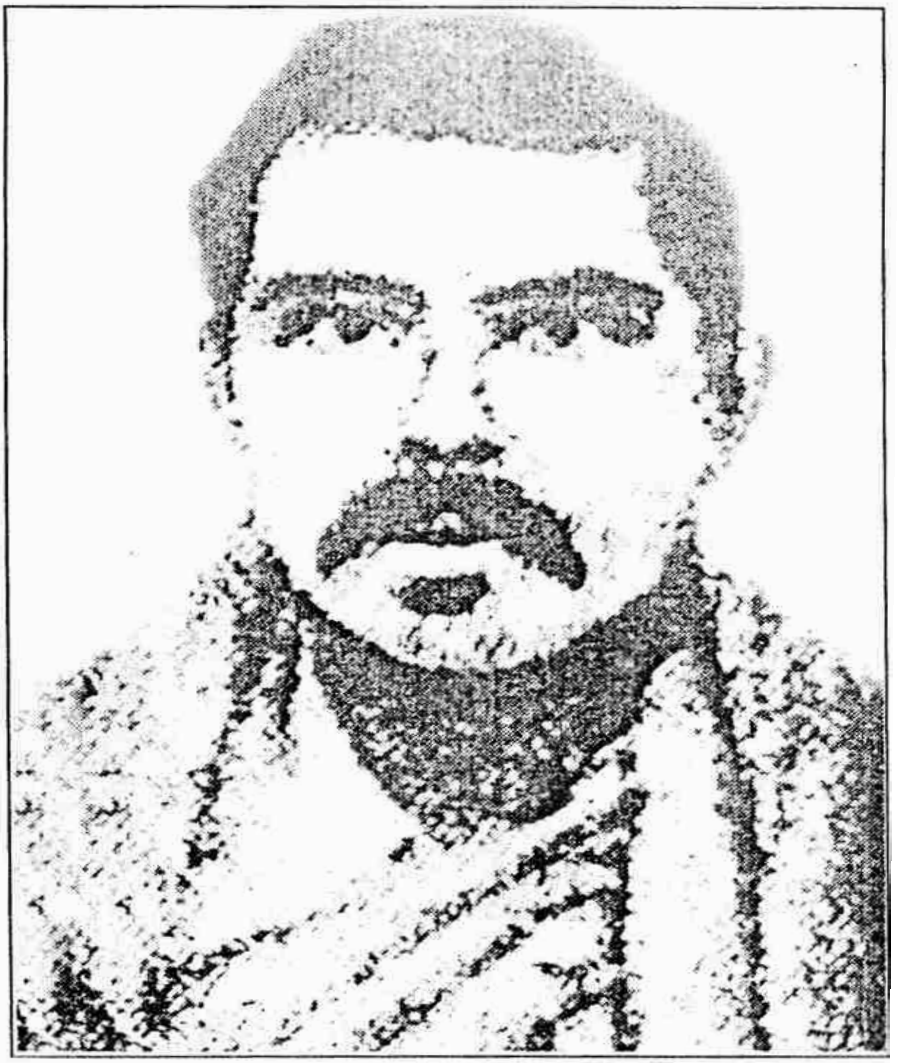

বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত

বাঁধিয়া দিয়া ক্ষুণ্ণমনে শুইয়া পড়িত। একদিন রাত্রে প্রায় ১টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি কানাই একজনের বিছানার চাদরের তলা হইতে একটা বিস্কুটের টিন চুরি করিয়া মহানন্দে বগল বাজাইতেছে। অরবিন্দবাবু পাশেই শুইয়া ছিলেন। আনন্দের সশব্দ অভিব্যক্তিতে তাঁহারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কানাই অমনি খানকয়েক বিস্কুট লইয়া তাঁহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিল। বিস্কুট লইয়া অরবিন্দবাবু চাদরের ভিতর মুখ লুকাইলেন। নিদ্রাভঙ্গের আর কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। চুরি ধরা পড়িল না।"

আলিপুর জেলে বন্দী বিপ্লবীদের মধ্যে হাসিঠাট্টার দ্বিতীয় নমুনা : "সন্ধ্যার সময় যখন সভা বসিত, তখন বার্লি সাহেব কিরকম ফিরিঙ্গি-বাঙ্গালায় সাক্ষীদের জেরা করে, নর্টন সাহেবের পেন্টুলানটা কোথায় ছেঁড়া আর কোথায় তালি লাগানো, কোর্ট ইন্সপেক্টরের গোঁফের ডগা ইঁদুরে খাইয়াছে কি আরশোলায় খাইয়াছে—এই সমস্ত বিষয়ে উল্লাসকর গভীর গবেষণা করিত। আর আমরা প্রাণ ভরিয়া হাসিতাম।"

আলিপুর জেলে নরেন গোঁসাই হত্যা কাহিনী উপেন্দ্রনাথ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। হত্যাকারী কানাইলাল দত্ত। ফাঁসির আগে সেই কানাইলালকেই উপেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দেখে উপেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল :

> যাহা দেখিলাম তাহা দেখিবার মতো জিনিসই বটে। আজও সে ছবি মনের মধ্যে স্পষ্টই জাগিয়া রহিয়াছে; জীবনের বাকী কয়টা দিনও থাকিবে। জীবনে অনেক সাধুসন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কানাই-এর মতো অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড়-একটা দেখি নাই। সে মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিষাদের ছায়া নাই, চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নাই—প্রফুল্ল কমলের মতো তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনি ফুটিয়া রহিয়াছে। চিত্রকূটে ঘুরিবার সময় এক সাধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জীবন ও মৃত্যু যাহার কাছে তুল্যমূল্য হইয়া গিয়াছে সেই পরমহংস। কানাইকে দেখিয়া সেই কথা মনে পড়িয়া গেল। জগতে যাহা সনাতন, যাহা সত্য, তাহাই যেন কোনও শুভ মুহূর্তে আসিয়া তাহার কাছে ধরা দিয়াছে। আর এই জেল, প্রহরী, ফাঁসিকাঠ—সবটাই মিথ্যা, সবটাই স্বপ্ন। প্রহরীর নিকট শুনিলাম ফাঁসির আদেশ শুনিবার পর তাহার ওজন ১৬ পাউন্ড বাড়িয়া গিয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, চিত্তবৃত্তিনিরোধের এমন পথও আছে যাহা পতঞ্জলিও বাহির করিয়া যান নাই। ভগবানও অনন্ত, আর মানুষের মধ্যে তাঁহার লীলাও অনন্ত।

আলিপুর জেলের কর্মচারীদের মধ্যে কিছু মানবিক মুখেরও দেখা পেয়েছিলেন উপেন্দ্রনাথ। যেমন, কোর্ট ইন্সপেক্টর আবদুর রহমান। বিপ্লবীদের দ্বীপান্তরে যাবার সম্ভাবনার কথা ভেবে তাঁর মুখে করুণার ছবি ফুটে উঠতো। আর একটি ঘটনার কথা—"আমাদের মধ্যে যাহারা সাজা পাইতো, তাহাদের জন্য একজন ইওরোপীয় প্রহরীকে পকেটে করিয়া কলা লুকাইয়া আনিতে দেখিয়াছি। চুপি চুপি কলা খাওয়াইয়া বেচারা পকেটে পুরিয়া খোসাগুলি বাহিরে লইয়া যাইতো।"

বন্দী জীবনের কোনও তথ্যই উপেন্দ্রনাথ বাদ দেননি। অত্যন্ত মুন্সীয়ানার সঙ্গে সেগুলি অতিরিক্ত শব্দের অপব্যয় না করে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে পরিবেশন করেছেন। যেমন, উল্লেখ করেছেন জেলের দেওয়ালে বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাস কানুনগোর চুন, ইঁটের গুঁড়ো ঘষে নানান রঙ তৈরি করে ছবি আঁকার প্রসঙ্গ। এমনকি, "প্রহরীদের অত্যাচার হইতে বাঁচিবার জন্য মাঝে মাঝে কাগজের উপর নখ দিয়া নানারূপ ছবিও তাহাদিগকে আঁকিয়া দিতেন।" কোনও কোনও বিপ্লবীর

জেলের দেওয়ালে কবিতা লেখার কথাও আছে। যেমন, একজন জেলের দেওয়ালে লিখেছিলেন :

ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে পাট শরীর হইল কাঠ
সোনার বরণ হইল কালি।
প্রহরী যতেক বেটা বুদ্ধিতে বোকা পাঁঠা
দিনরাত দেয় গালাগালি।।

গ্রন্থটির অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীঅরবিন্দ-প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ-সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক তথ্য উপেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন :

> মাথায় মাখিবার জন্য আমরা কেহই তেল পাইতাম না। কিন্তু দেখিতাম যে অরবিন্দবাবুর চুল যেন তেল চক্‌চক্ করিতেছে। একদিন সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কি স্নান করিবার সময় মাথায় তেল দেন?'
>
> অরবিন্দবাবুর উত্তর শুনিয়া চমকিয়া গেলাম। তিনি বললেন—'আমি তো স্নান করি না।'
>
> জিজ্ঞাসা কবিলাম—'আপনার চুল তবে অত চক্‌চকে হয় কি করে?'
>
> অরবিন্দবাবু কহিলেন—'সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে কতকগুলো পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আমার শরীর থেকে চুল বসা (fat) টেনে নেয়।'
>
> ...তাহার পর ডকের মধ্যে একদিন বসিয়া থাকিতে থাকিতে লক্ষ্য করিলাম যে, অরবিন্দবাবুর চক্ষু যেন কাচের চক্ষুর মত স্থির হইয়া আছে; তাহাতে পলক বা চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নাই ;...
>
> শেষে শচীন আস্তে আস্তে তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি সাধন করে কি পেলেন?'
>
> অরবিন্দ সেই ছোট ছেলেটির কাঁধের উপর হাত রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন,—'যা খুঁজছিলাম, তাই পেয়েছি।'...মকদ্দমার ফলাফলের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—'আমি ছাড়া পাব।'
>
> ফল তাহাই হইল।

অন্যদিকে, বেশ কয়েকজন বিপ্লবীকে আন্দামানে কারান্তরালে পাঠানোর হুকুম হলো। উল্লাসকর দত্তের ফাঁসির আদেশ হয়েছিল। একথা জেনে উল্লাসকরের হাস্যময় প্রতিক্রিয়া ছিল, 'দায় থেকে বাঁচা গেল'। এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে একজন ইওরোপীয় প্রহরী তাঁর এক বন্ধুকে ডেকে বলেছিলেন, 'Look Look! The man is going to be hanged and he laughs!' শুনে আইরিশ বন্ধুটি প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, 'Yes, I know; they all laugh at death.' ছোট্ট এই তথ্যটি দিয়ে উপেন্দ্রনাথ অগ্নিযুগের বরণীয় বিপ্লবীর সামগ্রিক চরিত্রটি পাঠকদের জানিয়ে দিলেন।

কিন্তু এরই সঙ্গে সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে তখনকার বিপ্লবী সমিতিগুলির ত্রুটির কথাও উল্লেখ করেছেন, যা কিনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক তথ্য :

> দলাদলি ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের ফলেও অনেকসময় অনেক সমিতির গুপ্ত কথা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। যে জাতি বহুদিন শক্তির আস্বাদন পায় নাই, তাহাদের নেতারা যে প্রথম প্রথম ক্ষমতালোলুপ হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কিছুই নাই। আর নেতাদিগের মধ্যে অযথা প্রভুত্ব প্রকাশের ইচ্ছা থাকিলে অনুচরদিগের মধ্যে ঈর্ষা ও অসন্তুষ্টি অনিবার্য।

পাশাপাশি ইওরোপীয় প্রহরীদের মধ্যেও উপেন্দ্রনাথ দলাদলি প্রত্যক্ষ করেছেন :

> ইওরোপীয় প্রহরীরাও প্রায় সমস্ত দিন জেলের মধ্যে বন্ধ থাকিয়া হাঁপাইয়া উঠিত। তাহাদের মধ্যেও বেশ একটু দলাদলি ছিল। এক দল অপর দলকে জব্দ করিবার জন্য মাঝে মাঝে আমাদেরও সাহায্যপ্রার্থী হইত; এবং তাহাদের কথাপ্রসঙ্গে জেলের অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশ পাইতো।

এর পরেই উপেন্দ্রনাথ শুরু করেছেন আন্দামান জেলের কথা। এবং জেলে পৌঁছেই বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁদের পৈতে কেড়ে নেওয়া হয়। উপেন্দ্রনাথের এ সম্পর্কে তির্যক এবং বিতর্কিত মন্তব্য হলো, "দেশের জেলে ঐরূপ কোনও নিয়ম না থাকিলেও কালাপানিতে ঐ নিয়মই বলবৎ। জেল জগন্নাথ ক্ষেত্র, এখানে জাতিভেদ মরিয়া প্রেতদশা লাভ করিয়াছে। তবে মুসলমানদের দাড়ি বা শিখের চুলে হাত দেওয়া হয় না; কিন্তু গোবেচারা ব্রাহ্মণের পৈতা কাড়িতে সবাই ক্ষিপ্রহস্ত। তাহার কারণ, শিখ ও মুসলমান গোঁয়ার, কিন্তু ব্রাহ্মণ নিরীহ।" মন্তব্যের শেষ অংশটি অবশ্যই বিতর্কের বিষয় হতে পারে!

আন্দামানে সাধারণ কয়েদীদের চরিত্র সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথের মনে হয়েছে তারা অনেকটাই ভীতু প্রকৃতির ছিল, যার ফলে সুবিচার পাবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না, কারণ 'নিজের ঘাড়ে বিপদ কে টানিয়া আনিতে যাইবে?' অন্যদিকে উপেন্দ্রনাথ এও লক্ষ্য করেছিলেন যে, "কিসে জেলের আয় বৃদ্ধি হয়, সুপারিন্টেডেন্ট হইতে আরম্ভ করিয়া চুনোপুঁটি অফিসার পর্যন্ত সকলেরই সেই দিকে দৃষ্টি। কয়েদী মরুক আর বাঁচুক, কে তাহার খবর রাখে?" বন্দীদের জন্য এত কঠোর ও অমানুষিক পরিশ্রমের নির্দেশ ছিল যে তারা সে কাজ যাতে করতে না হয় তার জন্য নানান পরিকল্পনা করতো। একজন বাঙালি কয়েদীর কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, "একদিন বেগতিক বুঝিয়া সে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া গান জুড়িয়া দিল। চোখে চুনের সামান্য গুঁড়া লাগাইয়া চোখ দুইটা লাল করিয়া লইল; আর আবোল-তাবোল বকিতে আরম্ভ করিল। ভাত খাইবার সময় মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। প্রহরীরা তাহাকে জেলারের কাছে ধরিয়া লইয়া গেল। জেলার গোটা দুই কলা আনিয়া তাহার হাতে দিলেন। সে কলা দুটো খাইয়া পরে খোসা-গুলোও মুখে পুরিয়া চিবাইতে লাগিল। জেলার স্থির করিলেন লোকটা সত্য সত্যই পাগল; তা না হইলে খোসা চিবাইতে যাইবে কেন?

লোকটা ফিরিয়া আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হাঁরে, খোসা চিবুতে গেলি কেন?'

সে বলিল, 'কি করি বাবু সাহেব, বেটাকে তো বোকা বানাতে হবে। একটু কষ্ট না করলে কি আর পাগল হওয়া চলে?'..."

আলিপুর জেলের তুলনায় আন্দামানে বন্দীদের খাওয়াদাওয়া আরও নিকৃষ্ট মানের ছিল। রেঙ্গুন চালের ভাত ও মোটা মোটা রুটি, কচুর গোড়া, ডাঁটা ও পাতা, চুপড়ি আলু, খোসাসমেত কাঁচা কলা ও পুঁই শাক, ছোট কাঁকর এবং ইঁদুর নাদি একসঙ্গে সেদ্ধ করে বন্দীদের খেতে দেওয়া হতো, যা উপেন্দ্রনাথের ভাষায় "যে পরম উপাদেয় ভোজ্য প্রস্তুত হয়, তরকারির বদলে তাহার ব্যবহার করিতে গেলে চক্ষে জল না আসে, বাঙলা দেশে এমন ভদ্রলোকের ছেলে এ দুর্ভিক্ষের বৎসরেও বড় বিরল।" এছাড়া আরেকরকম খাবার ছিল গুঁড়ো চাল ফুটন্ত জলে ফেলে দিয়ে একধরনের বস্তু, যার নাম ছিল 'কঞ্জি'। এর ওপর "কয়েদীর খোরাক চুরি হইয়া বাজারে ও

গ্রামে গ্রামে বিক্রি হয়। সাধারণ কয়েদী হইতে ইওরোপীয় কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই এই চুরির কথা বেশ জানেন; কিন্তু চুরি কখনও বন্ধ হয় না। অধিকাংশ কর্মচারীই ঘুষখোর; সুতরাং এ চুরি-রোগের প্রতিকার নাই।"

আন্দামানের জেলে বন্দীদের কাজ ছিল নারকেলের ছোবড়া পেটানো, তার থেকে দড়ি পাকানো, শুকনো নারকেল এবং সরষে ঘানিতে পিষে তেল বের করা, এবং নারকেলের মালা থেকে ডাঁকোর খোল তৈরি করা। ছোবড়া পেটানো ব্যাপারটি প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথের বক্তব্য, "একখণ্ড কাঠের উপর এক একটি ছোবড়া রাখিয়া কাঠের মুগুর দিয়া পিটিতে পিটিতে ছোবড়াটি নরম হইয়া আসে। ছোবড়াগুলি পিটিয়া নরম হইলে তাহাদের উপরকার খোসা উঠাইয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর সেইগুলি জলে ভিজাইয়া পুনরায় পিটিতে হয়। পিটিতে পিটিতে ভিতরকার ভুসি ঝরিয়া গিয়া কেবলমাত্র তারগুলিই অবশিষ্ট থাকে। এই তারগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া পরিষ্কার করিয়া প্রত্যহ এক সেরের একটি গোছা প্রস্তুত করিতে হয়।" প্রত্যেককে ২০টি ক'রে নারকেলের শুকনো ছোবড়া দেওয়া হতো। আর উপেন্দ্রনাথের গ্রন্থে সরষে ঘানিতে পিষে তেল বের করার প্রসঙ্গটি পড়লে উপলব্ধি করা যায় বন্দীদের উপর কতটা নির্মম এবং অমানুষিক অত্যাচার চালানো হতো।

> উল্লাসকরকে যে সরিষা পিষিবার ঘানিতে জোড়া হইল তাহা অনেকটা আমাদের কলুর বাড়ির দেশী ঘানির মতো, আর হেমচন্দ্র, সুধীর, ইন্দু প্রমুখ বাকী কয়জনকে যে ঘানিতে পাঠানো হইল তাহা হাত দিয়া ঘুরাইতে হয়। প্রত্যহ এক-একজনকে দশ পাউন্ড সরিষার তেল বা ত্রিশ পাউন্ড নারিকেল তেল পিষিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। মোটা মোটা পালোয়ান লোকও ঘানি ঘুরাইতে হিমসিম খাইয়া যায়; আর আমাদের যে কি দশা হইল তাহা মুখে অবর্ণনীয়। জেলের যে অংশে তেল পেষা হয়, দুইজন পাঠান পেটি অফিসার তখন সেখানকার হর্তাকর্তা।...তাড়াতাড়ি কাঁধের উপর পঞ্চাশ পাউন্ড নারিকেলের বস্তা ও হাতে একটা বালতি লইয়া তেতলায় চড়িয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। আর সে তো কাজ নয়, রীতিমত মল্লযুদ্ধ। আট দশ মিনিটের মধ্যেই দম চড়িয়া জিভ শুকাইতে আরম্ভ হইল। এক ঘন্টার মধ্যেই গা হাত পা যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল।...দশটার ঘন্টার পর যখন আহার করিতে নীচে নামিলাম, তখন হাতে ফোস্কা পড়িয়াছে, চোখে সরিষার ফুল ফুটিতেছে আর কানে ঝিঁঝিঁপোকা ডাকিতেছে।

আর আন্দামানের শাস্তি?—"রামলাল ফাইলে টেড়া হইয়া বসিয়াছে। দাও উহার ঘাড়ে দুইটা রদ্দা; মুস্তাফা আওয়াজ দিবামাত্র খাড়া হয় নাই, অতএব উহার গোঁফ ছিঁড়িয়া লও। বাকাউল্লার পায়খানা হইতে ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছে, অতএব তিন ডান্ডা লাগাইয়া উহার পশ্চাদ্দেশ ঢিলা করিয়া দাও।"

উপেন্দ্রনাথ আন্দামানে বন্দী অবস্থায় থাকাকালীন তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হলো জেলখানার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ভেদ। গ্রন্থকারের এ সম্পর্কে মন্তব্য হলো, "এই দলাদলির ফলে আর কিছু হোক নাই হোক, হিন্দুর টিকি ও মুসলমানের দাড়ি সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে।" কিন্তু শেষে দুটি সম্প্রদায়ই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, 'আমরা হিন্দুও নই, মুসলমানও নই—আমরা বাঙালি।' সঙ্গে সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ এও লক্ষ্য করেছিলেন যে, "দলাদলিটা শুধু সাধারণ কয়েদীদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না; রাজনৈতিক

কয়েদীদের মধ্যেও দলাদলির অভাব ছিল না।" দ্বিতীয়ত, কারান্তরালে বিপ্লবীদের মধ্যে ঈর্ষার আধিক্য, যা কিনা 'বীভৎস' রূপ ধারণ করতো। ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করে উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> মারাঠী নেতারা মাঝে মাঝে প্রমাণ করিতে বসিতেন যে, যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' গানে সপ্তকোটি কণ্ঠের কথা আছে, ত্রিশ কোটি কণ্ঠের কথা নাই, এবং যেহেতু বাঙালী কবি লিখিয়াছেন 'বঙ্গ আমার জননী আমার' সেই হেতু বাঙালীর জাতীয়তাবোধ অতি সঙ্কীর্ণ। একজন পাঞ্জাবী আর্যসমাজী নেতা তাঁহার বাঙালী-বিদ্বেষ প্রচার করিবার আর কোনো রাস্তা না পাইয়া একদিন বলিয়াছিলেন যে, যেহেতু রামমোহন রায় এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন করিবার জন্য ইংরেজ গভর্নমেন্টকে পরামর্শ দিয়াছিলেন সেহেতু তিনি দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক।...হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবীরা গোঁয়ার, বাঙালী বাক্যবাগীশ, মাদ্রাজী দুর্বল ও ভীরু—একমাত্র পেশোয়ার বংশধরেরাই মানুষের মতো মানুষ—নানা যুক্তিতর্কের ভিতর দিয়া এই সুরই ফুটিয়া উঠিত।

আর তৃতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটির উল্লেখ উপেন্দ্রনাথ করেছেন তা হলো বিপ্লবীদের 'নিজেদের অন্তর্বিরোধ'।

উপেন্দ্রনাথের গ্রন্থটি পাঠে আন্দামান জেলের তিনটি মর্মান্তিক ঘটনার কথা পাঠক জানতে পারবে। জেল কর্তৃপক্ষের নির্মম এবং পাশবিক অত্যাচারের ফলেই ঘটনাগুলি ঘটে। প্রথম ঘটনা বিপ্লবী ইন্দুভূষণ রায়ের উদ্‌বন্ধনে আত্মহত্যা। ঘটনাটি উপেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থে জানাতে গিয়ে লিখেছেন, "জেলখানার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপমানে সে যেন দিন দিনই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল; মাঝে মাঝে বলিত—'জীবনের দশটা বৎসর এই নরকে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব'। একদিন রাত্রে সে নিজের জামা ছিঁড়িয়া দড়ি পাকাইয়া পিছনের ঘুলঘুলিতে লাগাইয়া ফাঁসি খাইল।"

দ্বিতীয় মর্মান্তিক ঘটনাটি হলো বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের অত্যাচারের ফলে উন্মাদ হয়ে যাওয়া। তাঁকে চড়া রোদে ইঁট তৈরি করার কাজ দেওয়া হয়েছিল। রাজি না হলে "তাহার সাতদিন দাঁড়া হাতকড়ির ব্যবস্থা হইল। কিন্তু সাতদিন আর পূর্ণ হইল না। প্রথম দিনই বেলা ৪।। টার সময় হাতকড়ি খুলিতে গিয়ে পেটি অফিসার দেখিল যে, উল্লাসকর জ্বরে অজ্ঞান হইয়া হাতকড়িতে ঝুলিতেছে। তখনই তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠানো হইলো। রাত্রে শরীরের উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রী পর্যন্ত চড়ে। প্রাতঃকালে দেখা গেল যে, জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে কিন্তু উল্লাসকর আর সে উল্লাসকর নাই। আসন্ন বিপদের মধ্যেও যিনি চিরদিন নির্বিকার, তীব্র যন্ত্রণায় যাঁহার মুখ হইতে কখনও হাসির রেখা মুছে নাই, তিনি আজ উন্মাদ রোগগ্রস্ত।" অবশেষে উল্লাসকরকে মাদ্রাজের পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর সম্পর্কে ডেপুটি কমিশনার Lowis সাহেব বলেছিলেন, 'Ullaskar is one of the noblest boys I have ever seen, but he is too idealistic.'

আর তৃতীয় মর্মান্তিক যে খবরটি উপেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, তা হলো বালেশ্বর মকদ্দমার যতীশচন্দ্র পালের পোর্টব্লেয়ার জেলে পাগল হয়ে যাওয়া। কারণ, ঐ একহ—অমানুষিক অত্যাচার। 'কুঠরিবদ্ধ অবস্থায় তিনি একেবারে উন্মাদ হয়ে যান।'

পোর্টব্লেয়ার জেলে উপেন্দ্রনাথরা শুরুতে বেতন পেতেন মাসে বারো আনা। পরে তা বেড়ে হয়েছিল মাসিক এক টাকা।

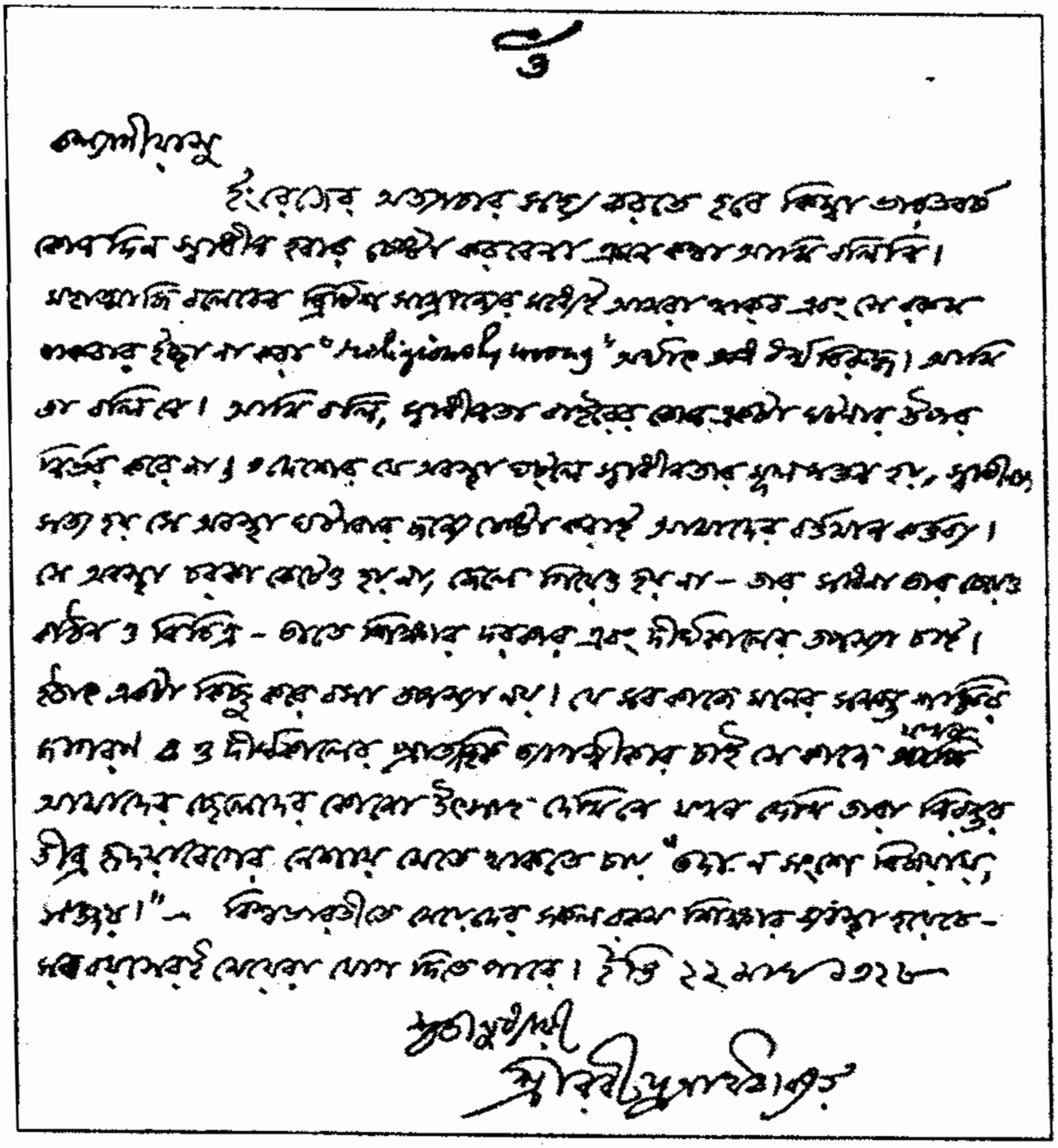

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ে কাদম্বিনী দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি

সবশেষে বলি, *নির্বাসিতের আত্মকথা*-র মতো এমন আরো কয়েকটি গ্রন্থের কথা মনে পড়ে যায়, যেগুলি বাঙালি পাঠক-পাঠিকাদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। দুর্ভাগ্যবশত, গ্রন্থগুলি বর্তমানে হাতের কাছে পাওয়া সহজলভ্য নয়। কারণ বেশির ভাগ গ্রন্থের আর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় না। অন্যদিকে নামমাত্র কটি গ্রন্থাগারে এগুলি পাওয়া যেতে পারে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : সতীশচন্দ্র পাকড়াশির *অগ্নিযুগের কথা*, গিরিজাশংকর রায়চৌধুরীর *ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ*, ড: ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অপ্রকাশিত *রাজনীতিক ইতিহাস*, হেমচন্দ্র কানুনগোর *বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা*, অমলেন্দু দাশগুপ্তের *ডেটিনিউ* এবং মতিলাল রায়ের *আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী*। এবং অবশ্যই ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের *বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি* ও নলিনীকিশোর গুহ-র *বাংলায় বিপ্লববাদ*।